ভীতি

বর্ষা বসু

অতি সাধারণ মানুষের, অতি গতানুগতিক জীবনযুদ্ধের অনেকের এবং অনেক কিছুর সঙ্গে লড়তে লড়তে, ক্লান্ত জীবনে, তোমার ক্লান্তির সুযোগ নিয়ে, শান্তির পিপাসায় তোমার তৃষ্ণার্ত অস্তিত্বের সুযোগ নিয়ে কখন সে যে ঢুকে পড়ে, বোঝাই যায় না। কিন্তু সে প্রবেশ করে ফেলেছে - ভীতি।

কী অদ্ভুত! ভীতি শব্দটা অত খারাপ নয়, অন্তত ডিগ্রেডিং তো নয়ই, কিন্তু সেই ভীতি যখন তোমাকে 'ভুতু' করে দেয়, তখন ওটা একটা গালাগালির মতো হয়ে যায়। বড় বিশ্রি গালাগালি নিজের চোখে নিজেকে যেন কোনো উচ্চতা থেকে নিম্নতায় নামিয়ে দেয়।

কিন্তু এসব কথা কিছু উঠতে পারেননি হরিসাধন। কাজের মাসির প্রশ্ন, -একী বাবু, কাল রাত্তিরের সব খাবার তো পড়ে আছে, আপনিও খাননি, দাদাও খায়নি। আপনার কি শরীর খারাপ? দাদা কোথায়? ইত্যাদির জবাবে, ক্ষিদে ছিল না আর শঙ্কু ওর বন্ধুর বাড়িতে, এ দুটো মিথ্যে কথা ছাড়া কিছুই বলা হয়নি। কাজের মাসি, সকালের খাবার রাখা রইল, বলে চলে গেছে। হরিসাধন বাগানের কোণে শিউলি গাছের তলায় দাঁড়িয়ে আছেন। কাজের মাসির এনে দেওয়া চেয়ারটিকে আগ্রাহ্য করে।

ভীতু কথাটা কেন এত ভীষণ ভাবে লেগেছে? সে কথাটা কী শঙ্কুর মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছে বলে? নাকি এই ঘুন - পোকার মতো ক্লান্তির আক্রমণ আর ঘাতকের মনে শান্তির পিপাসায় তৃষ্ণার্ত হয়ে থাকার সিচ্যুয়েশনটা ওকে বোঝাতে পারেননি বলে? তবে বোঝাবেনই বা কী করে? নিজেই কি ছাই বুঝেছেন ঠিক মতো? শঙ্কুর মা হয়ত বুঝেছিল, তাই যখনি মানুকে বলতেন - তোমার কাজ কি আর শেষ হয় না? - খুব গম্ভীর হয়ে তখনি জবাব দিত, কাজ কি আর শেষ হয়? কাজ হলো অস্ত্র, জীবনযুদ্ধে বেঁচে থাকার সবচেয়ে বড় অস্ত্র, যতদিন জীবন ততদিন যুদ্ধ, আর যতদিন যুদ্ধ ততদিন অস্ত্র চাই।

তারপর আবার হেসে যোগ কর। - তবে একটা উপায় আছে।

-সেটা কী?

- বানপ্রস্থ অবলম্বন করা। কিন্তু আমি বাবা তা পারব না। সংসারে থেকেও তার সব ঝুট-ঝামেলা সম্বন্ধে নির্লিপ্ত থেকে জীবন কাটানো আমার কোনো বাহাদুরীর কাজ মনে হয় না। মনে হয়, এ যেন বেঁচে থেকেও মরে থাকা। সে আমার দ্বারা হবে না।

হরিসাধন কি তবে একটা অ-চিন্তিত অ-সম্ভব পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন যেখানে সংসারে থাকবেন আর সেই ক্লান্তি - শান্তির জুটির আক্রমণ হলেই দৌড়ে চলে যাবেন সেই বানপ্রস্থের আশ্রয়ে? তাই কি হয়?

- এ কী হরিসাধনবাবু, এত রোদে বাগানে কি করছেন? এত রোদে দাঁড়ালে কি আমাদের এই বয়সে সহ্য হয়, এখন আমাদের সময় মতো খাওয়া, শোওয়া...যান যান ভেতরে যান। প্রতিবেশী মর্নিংস্কুল ফেরত নাতির হাত ধরে চলে যান।

খাওয়া! শোওয়া! না, অত বোধহয় জরুরি নয়। কাল রাত থেকে খাইনি, কিন্তু কই ক্ষিদে তো পাচ্ছে না! ঘুমও পাচ্ছে না - যদিও কাল সারারাত চোখ চেয়ে জেগেছিলেন - ঘুম দূরের কথা, বিছানায় যাবার কথা ভাবলে বিভীষিকা মনে হচ্ছে। কাল সারারাত ওই বিছানায় অনড় হয়ে পড়েছিলেন, ছটফট করবার শক্তিটুকুও যেন লোপ পেয়ে গেছিল। বারবার কানে আসছিল শঙ্কুর কথা - তুমি যদি বাগানের এক ইঞ্চি জমি দিতে রাজি হও, তবে আমি কিন্তু বাড়ি ছেড়ে চলে যাব। তুমি থাকবে তোমার বাড়িতে। আমি জমি দিতে রাজি নই, আমি তোমার মতো ভীতু নই।

শেষ বয়েসের সন্তান শঙ্কুর রাগ চিরদিনই বেশি, মেয়ে মাধুর মতো ঠান্ডা নয়, তবে সত্যিই না খেয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবে - সারারাত ফিরবে না, কোনো খবর দেবে না - 'তোমার বাড়িতে তুমি থাকো' বলে!

'তোমার' কথাটার ওপর জোর পড়েছিল খুব বেশি। প্রথম যেদিন নতুন বাড়িতে এলেন, ওদের সবাইকার কী আনন্দ! শঙ্কুতো সারাদিন ধরে দৌড়োদৌড়ি করে বেড়িয়েছিল। মনু আর মাধু নানারকম প্ল্যান করছিল কেমনভাবে বাড়ি সাজানো হবে। হরিসাধনের সেদিন একবারও মনে হয়নি যে বাড়িটা আমার। মনে হয়েছিল বাড়িটা মনুর, বাড়িটা মাধুর, বাড়িটা শঙ্কুর। ওদের জন্যই প্রাইভেট কো-অপারেটিভের কাছ থেকে প্লটটা কেনবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বাড়ি বানাতে শুরু করেছিলেন, তখনও অনেক প্লট খালি। পাশে কো - অপরেটিভের চেয়ারম্যান রামদীন ঠাকুরের প্লট তো বহু বছর খালি ছিল। মাঝে মাঝে ঠাকুর ও তার স্ত্রী এসে দেখে যেতেন। এমনিই একদিন মনু যখন বাগানের কোণে শিউলি গাছ পুঁতছে, তখন রামদীন ঠাকুরের স্ত্রী দুলারীর সঙ্গে আলাপ হয়। বাগানের কাজ করে বাড়িতে এসে অবাক হয়ে যাওয়া গলায় মনু বলেছিল, -এ আবার কী কথা!

-কেন? কী কথা?

- ঠাকুরের স্ত্রী বলছিলেন যে, ওঁরা নাকি জমিদার ছিলেন এবং তার আগে ওঁদের পূর্বপুরুষ নাকি ডাকাত ছিলেন।

- তাতে আশ্চর্য হবার কী আছে? অনেক জমিদারের পূর্বপুরুষই ডাকাত ছিলেন।

- কিন্তু তা নিয়ে কী কেউ অহংকার করে? বরং অনেক ভালো কাজটাজ করে, মন্দির - টন্দির বানিয়ে সেই ডাকাত থাকার কথাটা জমিদাররা ভুলতে আর ভোলাতেই চেয়েছিল। আর ইনি তো গর্ব করে বলেছেন!

পরদিন রামদীন ঠাকুর এসেছিলেন। জানিয়েছিলেন যে, আপাতত বাড়ি বানাবার কোনো প্ল্যান ওঁর নেই, তবে জমিটা পড়ে থাকতে দেবেন না। জমিতে আলু চাষ হবে। অনুমতি চেয়েছিলেন হরিসাধনের বাগানের এক কোণে ছোট একটা পাম্পঘর বানাবার। হরিসাধন অবশ্যই অনুমতি দেননি। তাও মনুর রাগ যেতে চায় না।

-ওমা! এ কী কথা! নিজের জমিতে করুক, আমাদের জমি আমরা কেন দেব? খুঁতে হয়ে যাবে না? আমি বলে কত শখ করে ওখানে শিউলি গাছ...

— কে দিচ্ছে জমি? অত উত্তেজিত হচ্ছ কেন?

সেদিনের পর বহু বছর কেটে গেছে, বহু কিছু ঘটে গেছে। মেয়ে মাধুর বিয়ে হয়ে গেছে এ শহরেই, ছেলে শঙ্কু মেডিক্যাল কলেজে, নিজেও রিটায়ার করেছেন। মনু ওর পোঁতা শিউলি গাছে ফুল দেখবার আগেই - একটু যেন বেশি তাড়াতাড়ি - চলে গেছে। আর রামদীন ঠাকুরের আলুর খেতি ওঁর সমস্ত প্লট অতিক্রম করে, দুটি প্লটের মাঝখানে যে লোকচলাচলের অপ্রশস্ত রাস্তা তাকেও ধরে ফেলেছে।

এতদিন পরে আবার সেই কথা উঠল। এবার রামদীন ঠাকুর নিজের প্লটে বাড়ি বানাবেন। কিছুদিন আগে 'ভূমিপূজন' করে প্রসাদ হাতে ঠাকুরসাহেব এসে সে কথা বলে গেলেন, এবং আশ্চর্য করে দিয়ে, আবার হরিসাধনের বাগানের কোণে পাম্পরুম বসাবার অনুমতি চাইলেন। হরিসাধন বিনীত কিন্তু দৃঢ়ভাবে আবার ওঁর প্রস্তাব ফিরিয়ে দিলেন। সঙ্গে এও যোগ করলেন যে, এখন ওই কোনে মনুর লাগানো শিউলি গাছ বড় হয়ে উঠেছে।

পরদিন, মানে গতকাল সেই প্রসঙ্গে কথা বলতে ঠাকুরের চার ছেলে এসেছিল। লম্বা - চওড়া, ফর্সা, সুদর্শন। কিন্তু কটা চোখগুলোর মধ্যে কোথায় যেন কী এক রকম হিংস্রতার ঝলক। চার ছেলের মধ্যে কে বড় কে ছোট বোঝাই যাচ্ছিল না। চারজন এসে বসবার ঘরে বসার পরে, হরিসাধনের নিজেকে খুব ক্ষুদ্র (শারীরিক দিক থেকে) মনে হচ্ছিল। ওদের বসবার ভঙ্গিটাও এমন যে, মনে হচ্ছিল বসবার ঘরটা ওদেরই। হরিসাধনের উপস্থিতিটা যেন একটা অনধিকার প্রবেশ।

– চাচাজী, বাবুজি তো আপনার সঙ্গে আগেই কথা বলেছে, জমীন তো একটুখানি চাই, খুব কম, শুধু ছোট্ট একটা পাম্পরুম।

– আমি তো আগেই বলেছি, জমি আমি দিতে পারব না।

– দিতে পারব না বললে কী হয় চাচাজী, আমরা যথেষ্ট দাম দেব।

– কো- অপারেটিভের জমি তো বিক্রি করা যায় না!

– সব করা যায়, সব করা যায়। চারভাই এক অদ্ভুতভাবে একসঙ্গে হেসে ওঠে। ওদের সেই হাসি শুনে হরিসাধনের বুকের ভেতরটা কেমন হিমশীতল হয়ে যায়

– তাছাড়া, বাবুজী কী এক গাছের কথা বলছিল, সে আমরা উপড়ে নিয়ে অন্য কোথাও লাগিয়ে দেব, একস্পার্ট এসে করে যাবে।

– না, আমি জমি দেব না, আর শিউলি গাছও উপড়ে নেবে না।' কী এক গাছ' আর 'উপড়ে নিয়ে' দুটো কথা যেন জোরে ধাক্কা মারে তাঁর বুকে। হরিসাধনের কথা শুনে চারভাই চোখ চাওয়া-চাওয়ি করে হঠাৎ একসঙ্গে উঠে দাঁড়িয়েছিল।

– চাচাজী! -যাবার জন্য পা বাড়িয়ে একজন বলেছিল - একদিন সময় দিচ্ছি, কাল আবার আসব, আপনি ভেবে দেখুন। অন্যজন যোগ করেছিল - তবে ভেবে দেখবার বেশি কিছু নেই। জমি তো আমাদের দিতেই হবে। তৃতীয়জন বলেছিল - জমি আমরা নেবই, আপনি দিন বা না দিন।

চতুর্থজন, এই তিনজনকে এমনভাবে সামলে নিয়ে চলে গেছিল, যে হরিসাধনকে ভয়ঙ্কর একটা কিছু থেকে বাঁচাচ্ছে।

– জমি দেবার প্রশ্নই ওঠে না। সব কথা শুনে শঙ্কু রেগে বলে।

– ওই তো এক ফালি জমি, দিয়ে দিলেই বা ক্ষতি কি?

– ক্ষতি অনেক, ওদের দাদাগিরি সহ্য করলে...

– দাদাগিরি কিছু করেনি। যথেষ্ট সম্মান করে কথা বলেছিল...মিথ্যেটা অনায়াসে হরিসাধনের মুখ থেকে বেরিয়ে আসে। তাছাড়া একস্পার্ট এনে শিউলি গাছটা অন্য জায়গায় পুঁতিয়ে দেবে বলেছে।

– দেখো বাবা, তোমাকে সম্মান করে কথা বলেছে, কারণ তুমি তেমনভাবে প্রতিবাদ করনি। তেমনভাবে প্রতিবাদ করলেই সম্মান রক্ষা হত না। তাছাড়া এটা সম্মান বা শিউলি গাছের সেন্টিমেন্টের কথা নয়, এটা অধিকারের কথা।

– অত ঝামেলা আমার ভালো লাগে না। তাছাড়া অধিকারের কথা কি বলছিস তুই? ফুট খানেক জায়গা ছেড়ে পুরো রাস্তাটাতে যে আলুরক্ষেত হয়ে গেল, কী করলাম আমরা?

– রাস্তা কো-অপরেটিভের। সে প্রতিবাদ সবাই মিলে করা উচিত - এবং করব - কিন্তু বাড়িটা আমাদের, এখানে আমরা রাজা। এই চার দেওয়াল দিয়ে বাঁধা বাড়ি নামক ফোর্টটাকে আমাদেরই রক্ষা করতে হবে। চারিদিকের অধিকার হননের আক্রমণ আমাদের বাড়ির ভেতরে ঢুকতে দিওনা। তুমি এখন ভীতুর মতো কথা বোলো না।

শঙ্কুর কথা শুনে হরিসাধনের যেন মাথার ভেতরটা জ্বলে ওঠে, মাথার মধ্যে ভীড় করে আসে অনেক ঘটনা, যখন তিনিও অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন। কত যুদ্ধ করেছেন কর্মক্ষেত্রে, পরিবারের মধ্যে, সমাজের বিরুদ্ধে। আজ যদি উনি অন্যভাবে ভাবেন...!

– শঙ্কু, কী ক্ষতি হবে ওই এক টুকরো জমি দিলে? আমি শান্তি চাই, ভয় আমি পাই না।

– ভয়ই তুমি পাও। শঙ্কু হঠাৎ খুব রেগে ওঠে। জোরে জোরে বলে, -তোমার জমি, তোমার বাড়ি, তুমি যা ইচ্ছে তাই করো, তবে এ বাড়িতে আর থাকব না, তুমি থাকো, তোমার শান্তি নিয়ে।

তারপর শঙ্কু বেরিয়ে গেছিল। গতরাত থেকে, এখনও ফেরেনি।

সকালবেলা কলিং বেলের আওয়াজে তাড়াতাড়ি গিয়ে দরজা খুলে শঙ্কুকে পাননি, দাঁড়িয়ে ছিল চারভাই। সঙ্গে দুজন বন্দুকধারী ব্যক্তি। বন্দুক কেন? হরিসাধনকে ভয় দেখাতে? কিন্তু ভয় তো তাঁর করছে না! অন্তত বন্দুক দেখে তো

নয়ই। দরজা খুলে শঙ্কুকে সামনে না পেয়ে ভয় এখন শুধু একটাই! রাগ চন্ডাল। শঙ্কু ঠিক আছে তো!

– চাচাজী, আমাদের লোক এগারোটা নাগাদ আসবে। আজ পাঁচিলটা ভেঙে মেপে টেপে যাবে। কাল গাছ সরাবার লোক এসে গাছ সরিয়ে নেবার পর, পাম্পরুমের কাজ শুরু হবে। চারভাই হরিসাধনকে জানায়। একদিনের দেওয়া সময়ে উনি কী সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, সে প্রশ্ন তারা করে না।

– জমি আমি দেব না। পাঁচিলও কেউ ভাঙবে না।

যেন ধৈর্যের শেষ সীমায় এসে পৌঁছেছে। এমনভাবে একভাই বলে ওঠে-কী আপনি করবেন চাচাজী? পুলিশ ডাকবেন? কে যাবে ডাকতে? আপনার ছেলে? ডেকে দেখুন!

– পুলিশ কেন ডাকব? নিজে দাঁড়িয়ে থাকব পাঁচিলের কাছে। পাঁচিল ভাঙতে হলে আগে আমার জীবন নিতে হবে। কথাটা এত নাটকীয় ভাবে বলতে চাননি, কিন্তু এমনিভাবেই বেরিয়ে আসে।

সেই মুহূর্ত থেকে হরিসাধন পাঁচিলের কাছে। ক্ষিধে পাচ্ছে না, তৃষ্ণা বোধ হচ্ছে না, ঘুম পাচ্ছে না। আর ওই যে চারটে বিশাল আকারের প্রাণী দুজন বন্দুকধারীকে নিয়ে পাশের প্লটে ঘোরাঘুরি করছে আর রক্তচক্ষু নিয়ে বারবার তাঁর দিকে তাকাচ্ছে, তাতে ভও করছে না। তাঁর মন প্রাণ সমস্ত সত্ত্বা শুধু বারবার অন্য এক ভয় আর্তনাদ করে উঠেছে - শঙ্কু তুই কোথায়? শঙ্কু তুই বোকার মতো কিছু করে বসিস না! অনেকক্ষণ হলো টুলু মিলু ভাইবোন মর্নিং স্কুলের শেষে বাড়ি ফিরল... 'এত রোদ্দুরে বাইরে বসে কেন'? নাতির হাত ধরে যেতে যেতে প্রতিবশী পরিতোষবাবু বলে গেলেন... এমন কি সেই চারজোড়া রক্তচক্ষু বন্দুকধারী নিয়ে চলে গেল, তবুও হরিসাধনের ভয় তাঁকে নড়তে দিল না পাঁচিলের কাছ থেকে, যেন পাঁচিল অক্ষত থাকলেই শঙ্কুও অক্ষত থাকবে।

রাতটা বন্ধুর বাড়িতে কাটিয়ে সকালে থানায় একটা এফ. আই. আর. অরবার পর থেকেই মনটা বাড়ির দিকে টানঠিল শঙ্কুর, কিন্তু যায়নি, ক্লাস করতে চলে গেছিল। যখন ফিরল, তখন বাড়িতে ভীড়। দ্রুতপায়ে ঘরে ঢোকবার আগেই দেখে প্রতিবেশী পরিতোষবাবু ডাঃ গুহকে নিয়ে বেরিয়ে আসছেন। তাঁর ক্লাস শঙ্কু করেছে। এও জানে, ওদের কলোনীর কাছাকাছিই তিনি থাকেন।

– এই যে শঙ্কর, তোমার বাবা হঠাৎ খুব অসুস্থ হয়ে পড়ায় ডাক্তারবাবুকে ডেকে এনেছিলাম। ডাক্তারবাবু, এই হলো শঙ্কর – ও ডাক্তারী পড়ছে – আপনার রোগীর ছেলে।

– কি হয়েছে বাবার? কি হয়েছে?

– না, ভয়ের কিছু নেই। তবে পালস্ রেট আর ব্লাড প্রেসার স্টেবিলাইজড না হওয়া পর্যন্ত তো সাবধানেই থাকতে হবে। ডিহাইড্রেশনটা সামলে যাবে, ড্রিপ দিয়ে দিয়েছি, হসপিটালাইজড্ করবার প্রয়োজন হবে বলে মনে হয় না। বক্তব্য শেষ করে যেতে গিয়েও থেমে শঙ্করকে আবার বলেন– চিন্তার কিছু নেই। আমার মোবাইল নম্বরটা রাখো।

শঙ্কু দ্রুতপায়ে বাবার ঘরে যায়।

কাজের মাসি, টুসু - মিলু, প্রতিবেশী পরিতোষবাবু এবং আরও যারা, সেই চারভাই এবং দুই বন্দুকধারীকে দেখেছে এবং জ্ঞান হারাবার আগে বলা হরিসাধনের কিছু অসংলগ্ন কথা শুনেছে, তারা শঙ্কুকে সিচ্যুয়েশনটা বোঝাবার আগেই ও ফোন তুলে নেয়, - দিদি, তুই এখনি চলে আয়, বাবার শরীরটা...

হরিসাধন ড্রিপ হাতে নিজের বিছানায় শুয়ে বুঝতে পারেন, কো-অপারেটিভের এক্সিকিউটভ মেম্বারদের চেয়ারম্যান রামদীন ঠাকুরকে বাদ দিয়ে এক আন-অফিসিয়াল মিটিং হয়ে গেল। আর মনে হলো তাদের নেওয়া সিদ্ধান্তে শঙ্কু খুশি। বাড়িতে কলোনীর ভীড় বাড়ছে। শঙ্কু, মাধুকে পেরিয়ে দু'একজন ছাড়া ওর ঘরে অবশ্য কেউ আসতে পারছে না, কিন্তু মাঝে মাঝেই দুটো - একটা কথা ভেসে আসছে-

– পুলিশে খবর দাও।

– পুলিশ ছাই করবে, তার থেকে বরং মিডিয়াকে খরব দাও। আজতকে...

– পুলিশ, মিডিয়া কিছুই দরকার নেই। যে জেনারেল মিটিং কল করা হবে, তাতে সবাই উপস্থিত থাকলেই হবে। কেউ অনুপস্থিত থাকবে না।

মাধু আর শঙ্কুর উৎকণ্ঠা ছাপিয়ে সারা বাড়িতে যেন একটা উদ্দীপনার ভাব।

শঙ্কু থেকে থেকেই এসে ড্রিপ -এর বোতল বের করছে, পালস্ রেট দেখছে, মাধু কাঁদলে তাকে বকছে আর হরিসাধনকে বলছে—

– আর কখনও বলবো না তুমি ভয় পাও, এবার প্লীজ আমাদের আর ভয় দেখিও না, জীবনে বলবো না- তুমি ভীতু।

কিন্তু 'ভীতু'র লেবেলটা কি সত্যিই উঠে গেল তাঁর অস্তিত্ব থেকে? চতুর্দিকেই তো ভয় আর ভয় থাকলেই ভীতি - শুধু কখনও কখনও বড় বড় ভয়গুলো ছোট ছোট ভয়গুলোকে সাহসে পরিণত করে তোলে, সবরকম মানুষের জীবনেই। কেউ সংসারের শোক, জরা, মৃত্যুর ভয়ে সংসার ত্যাগের সাহস পাচ্ছে, কেউ নিজের জীবন নিয়ে নেবার সাহস পাচ্ছে ক্ষমতা হারাবার ভয়ে, কেউ নিজের জীবন দিয়ে দেবার সাহস পাচ্ছে স্বাধীনতা হারাবার ভয়ে... আর হরিসাধনের চারজোড়া রক্তচক্ষু আর একজোড়া বন্দুকধারীকে অগ্রাহ্য করবার সাহস পাচ্ছে শঙ্কুদের হারাবার ভয়ে।

এই কি সাহস? বোধহয়, না।

লড়াই, সংগ্রাম এইসব বাদ দিয়ে যতদিন না মানুষ আর তার অধিকার এক অস্তিত্বের মধ্যে স্থিত হয়ে যায়, ততদিন বোধহয় ভীতিও যাবে না, আর সাহস ও তার প্রকৃত রূপ খুঁজে পাবে না।

– বাবা কী বলছ ঘুমের মধ্যে...? এবার শান্ত হয়ে ঘুমোও।